তারিখ 13 APR 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৮

দৈনিক সংবাদ

010

বাংলায় উচ্চতর বিজ্ঞান - গ্রন্থ ঃ সেকাল ও একাল

এস. এম. মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও প্রসার চাই এই দাবীর পক্ষে আলাদা করে আর বলার দরকার পড়ে না যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চাই। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরেই যে এই দাবী প্রথমবারের জন্য উঠেছে এটা মনে করার কোন কারণ নেই। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ১৭৮৫ সাল থেকে পরবর্তী সত্তর বছরে দেশের সকল প্রচলিত আইন-কানুন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে। এটা কারো শখের ব্যাপার ছিল না--প্রয়োজন ও প্রাণের তাগিদই কাজ করেছে এর পেছনে। তাই ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজভাষা হিসেবে ফার্সীর আমল যখন আর থাকলো না তখন ১৮৩৮ সালের ২৩শে জানুয়ারী এক সরকারী নির্দেশে বলা হলো, "ফোর্ট উইলিয়াম রাজধানীর অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্যে পারস্য ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে এবং এই রূপ করণার্থ ১লা জানুয়ারী তারিখ অবধি ১২ মাস নির্দিষ্ট হইল। শ্রীলশ্রীযুক্তের জ্ঞানপনার্থ এই নিয়ম সম্পাদন নিমিত্ত যেরূপ উদ্যোগ হয়েছে তাহার এক রিপোর্ট আগামী ১লা জুলাই তারিখে এবং তৎপরে ১৮৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে দিতে হইবে।" অর্থাৎ ছয়মাসের মাথায় অগ্রগতির রিপোর্ট আর এক বছরের মাথায় পুরা রিপোর্ট দেয়ার নির্দেশ।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ' বছর আগে বাংলা যখন বাঙ্গালীর ছিল না তখন বিদেশী শক্তি প্রশাসনিক স্বার্থেই এই নির্দেশ জারি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইতিহাস বলে নির্দেশের প্রয়োজন হলেও নির্দেশের আশায় বসে থাকেনি বিজ্ঞান লেখকরা। তার প্রমাণ ১৮১৫ সালে সরকারী নির্দেশ না থাকলেও উইলিয়াম ইয়েটস বাংলায় রচনা করলেন 'পদার্থবিদ্যা সার'।

তখন থেকেই শুরু হলো সংগঠিতভাবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পদার্থবিদ্যাসার প্রকাশের পাঁচ বছরের মধ্যে প্রকাশিত হলো বাংলা ভাষার প্রথম শরীর তত্ত্ব বিষয়ক বই ফেলিক্স কেরী কৃত 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'--যার পৃষ্ঠা সংখ্যা, ছিল ৬৩৮। শুধু বই রচনাই নয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাদানের এক ব্যাপক কর্মসূচীও হাতে নেওয়া হয় ব্যক্তিগত ও বেসরকারী উদ্যোগে। শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রী জন ম্যাক এই কর্মসূচীকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব হাতে নেন--বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এই খ্যাতিমান পুরুষের একটি গৌরবোজ্জ্বল আসন সব সময়ই থেকে যাবে। তাঁর প্রচেষ্টায়ই ভূগোল বিষয়ক প্রথম বাংলা বই 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' ১৮২০ সালের দিকে প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর থেকে। এখানে লক্ষণীয় যে, তখনো বাংলায় 'ভূগোল' কথাটির প্রচলন হয়নি। পরবর্তীতে ১৮২৭ সালে জে, ডি, পিয়ারসন সাহেব প্রথম ভূগোল শব্দটি ব্যবহার করেন। আলোচনার এই পর্যায়ে আমি ডঃ আনিসুজ্জামান প্রদত্ত একটি তালিকা (২১শে ফেব্রুয়ারী '৮৫) থেকে বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু বইয়ের কথা উল্লেখ করছি: গেলো শতাব্দীতে প্রকাশিত ও বহুল প্রচলিত এই বইগুলো হলো: পদার্থবিদ্যাসার (উইলিয়াম ইয়েটস ১৮১৫), ব্যবচ্ছেদবিদ্যা (এফ, কেরী ১৮২০), জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় (শ্রীরামপুর ১৮২০), চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম পরিভাষা (পিটার বৃটন ১৮২৫), ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ে কথোপকথন (জে, ডি, পিয়ারসন ১৮২৭), ভূগোল বৃত্তান্ত (ডব্লিউ এইচ, পিয়ার্স ১৮২৮), জ্যোতির্বিদ্যা (উইলিয়াম ইয়েটস ১৮৩৩), কিমিয়া বিদ্যাসার (জনম্যাক ১৮৩৪), ভূগোল (অক্ষয় কুমারদত্ত ১৮৪৮), লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া (মধুসূদন গুপ্ত ১৮৪৯), এনাটোমী (ঐ ১৮৫৩), প্রাকৃত ভূগোল (রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৫৪), মানব জন্মতত্ত্ব ও ধাত্রী বিদ্যা (অন্নদাচরণ খাস্তগীর ১৮৬৮), অস্ত্র চিকিৎসা (কালীচন্দ্র গুপ্ত ১৮৮১), নরশরীর বিধান (নীলরত্ন অধিকারী ১৮৮৭) অস্ত্র চিকিৎসা--হি,স, (জহির উদ্দিন আহমেদ ১৮৯০), সংক্ষিপ্ত শরীর তত্ত্ব (রাধা গোবিন্দ কর ১৮৯৩), রোগী পরিচর্যা (ঐ ১৮৯৩), সংক্ষিপ্ত ভেষজ তত্ত্ব বা মেটারিয়া মেডিকা (ঐ ১৮৯৭) ইত্যাদি। উল্লিখিত তালিকা থেকে এটা পরিষ্কার যে, গেলো শতকে পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা বিদ্যমান ছিলো। আরো লক্ষণীয় যে তৎকালে--"বঙ্গাদি তাবৎ পারস্য ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে"--জাতীয় কোন সরকারী নির্দেশের আশায় কেউ বসে থাকেনি, প্রয়োজনে ও প্রাণের তাগিদেই সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা হয়েছে তখন। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেও জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং এব্যাপারে কার্যকরভাবে সচেষ্ট থেকেছেন। এ প্রসঙ্গে সত্যেন বসুর একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, তা হলো: বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয় বলে যারা মনে করেন, হয় তাঁরা বিজ্ঞান জানেন না নয় তাঁরা বাংলা জানেন না। এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ না করলেই নয় যে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ধারাকে পরোক্ষভাবে হলেও অনেকখানি প্রভাবান্বিত করেছে।

এখন উচ্চতর বিজ্ঞান চর্চা: পটভূমি বাংলাদেশ পর্যায়ে আসা যাক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই স্কুল-কলেজ পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানের নানা শাখায় প্রচুর বইপত্র লিখা হয়েছে যদিও এগুলোর মান সম্পর্কে প্রায়ই সংবাদপত্রে আমরা নানা ধরনের বিতর্ক দেখে থাকি। তবে এটা বলা মোটেই কঠিন নয় যে, উচ্চতর পর্যায়ের অর্থাৎ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর জন্য বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা খুব একটা বেশী নয়। তার মধ্যে আবার স্নাতক (পাস) শ্রেণীর জন্য কিছু বই প্রকাশিত হলেও স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বইয়ের সংখ্যা নিদারুণভাবে কম। স্বাধীনতার ঠিক পরপরই বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক বই প্রকাশের জন্য অনেক প্রকাশনা সংস্থা এগিয়ে এলেও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বই প্রকাশের জন্য বিশেষ সাড়া লক্ষিত হয়নি। এর কারণ সংক্ষেপে পরে বলা যাবে। তবে জাতীয় ভিত্তিতে উচ্চতর পর্যায়ের বিজ্ঞানের বই প্রকাশনার জন্য আমি এই মুহূর্তে মনে করি বাংলা একাডেমী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতালাভের পাঁচ বছরের মধ্যে রসায়নবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, গণিত, পরিসংখ্যান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোল, ভূবিদ্যা, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বাংলা একাডেমী মোট ৪৯টি বই প্রকাশ করেছে, আর তখনও প্রকাশের অপেক্ষায় ছিলো ২৯টি বই। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালের প্রকাশনা তালিকায় দেখা যায় বিজ্ঞানের নানা শাখায় একাডেমী মোট ৯১টি বই প্রকাশ করেছে। অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাও বেশ কিছু বই প্রকাশ করেছে ইত্যবসরে, কিন্তু আমার হাতে আপাততঃ এগুলোর কোন পূর্ণ তালিকা নেই। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সুদীর্ঘ ৬৪ বছরে প্রায় পঞ্চাশটির মতো বই প্রকাশ করলেও আমার জানা মতে বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করেছে মাত্র দুটি।

এখন আমি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের মান সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। স্বাভাবিক কারণেই আমার বিবেচনা ও মন্তব্য আমার নিজস্ব বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রথমেই যদি ছাপার মান সম্পর্কে বলি তবে বলতে হয় প্রথমদিকে প্রকাশিত বইয়ের চেয়ে শেষের দিকের বইয়ে ছাপার মান যথেষ্ট উন্নত। এটা সকলেরই জানা যে, ভৌত বিজ্ঞানে বিশেষ করে গণিত ও পদার্থবিদ্যার বইয়ে প্রচুর গাণিতিক চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় যেগুলো প্রথম দিকে সম্ভবতঃ যোগাড় করা কঠিন হতো, যে কারণে অনেক বইয়েই আন্তর্জাতিকভাবে পরিগণিত আদর্শ চিহ্ন ব্যবহার করা যায়নি।

প্রসঙ্গতঃ আরেকটি বিষয়ে আমি আলোকপাত করতে চাই। আমার নিজের বিষয় পদার্থবিদ্যায় অনেক ছাত্র-পাঠক এমর্মে অভিযোগ করেছে যে উচ্চতর পর্যায়ের কোন কোন বইয়ের বিশেষ বিশেষ অংশ/অধ্যায় হয়তো সরাসরি কোন বিদেশী বই থেকে অনুবাদ করা হয়েছে, অথচ অনূদিত অংশে যথাযথ রেফারেন্স নেই-এক্ষেত্রে বিষয়টি আমার কাছে একধরনের চোরাশি বলে মনে হয়। বিশেষ করে যখন সতর্ক পাঠকের কাছে ব্যাপারটি ধরা পড়ে যায় তখন ঐ লেখক সম্পর্কে পাঠকের মনে স্বাভাবিক কারণেই একধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে এটাও লক্ষ্য করেছি যে, বিদেশী বই থেকে হয়ত একটা ছবি সরাসরি ব্লক করা হয়েছে, অথচ এর কোন পূর্ণ রেফারেন্স দেয়া হয়নি। এগুলো আন্তর্জাতিক প্রকাশনা রীতিনীতির পরিপন্থী।

আজ এটা কারো কাছে দুর্বোধ্য থাকার কথা নয় যে, উচ্চতর পর্যায়ে যেকোন বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা এতো ব্যাপক হয়ে গেছে যে গবেষণা পর্যায়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকলে কারো পক্ষেই বই লেখা সম্ভব নয় এবং উচিত ও নয়। কিন্তু, এখনো দেখা গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একটি বিষয় না পড়িয়েও ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গ ঐ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বই লিখেছেন, যার ফলশ্রুতি হলো কোন কোন স্থানে অর্থ অনর্থ হয়ে দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীসহ সকল জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার প্রস্তাব: লেখক ও অনুবাদক নির্বাচনে আপনারা আরো সচেতন হউন।

আলোচনায় এ পর্যায়ে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই সরকার থেকে যে নির্দেশ আসে তার একস্থানে বলা হয় যে, পরিভাষার অপেক্ষায় বসে না থেকে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রশাসনিক ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যতোটুকু সহজ ছিলো বিজ্ঞানের বই রচনায় তা সম্ভবতঃ ততো সহজ ছিলো না। আমার মনে হয়, পরিভাষার বিষয়টিকে বিজ্ঞান রচনায় হালকা করে দেখার কোন অবকাশ নেই। উল্লেখ্য যে, একই বৈজ্ঞানিক শব্দের দুটি বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হলে ছাত্র-পাঠকদের মধ্যে দুর্বোধ্যতা দেখা দিতে পারে যা মোটেই কাম্য নয়। সুতরাং আমার মনে হয় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনাকালে পরিভাষার ব্যাপারে রচয়িতাকে খুব বেশী স্বাধীনতা দেয়াটা ঠিক হবে না যার সদর্থ হলো, কেন্দ্রীয়ভাবে পরিভাষায় কোষ থাকতে হবে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে প্রকাশিত বইয়ের তালিকায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বইয়ের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এ ব্যাপারে আমি ঢাকার বেশ কিছু প্রকাশনা সংস্থার কাছে প্রশ্ন রেখেছি। তাদের অধিকাংশের মন্তব্য হলো: এটা বাস্তব সত্য যে প্রকাশনা একটি ব্যবসা। বই প্রকাশের আগেই এর ব্যবসায়িক দিকটা চিন্তা করা হয়। এটা উল্লেখ না করলেও চলে যে, বাংলাদেশে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা এমন বিরাট নয় যার ফলে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা অথবা কঠিন অবস্থার পদার্থ বিদ্যার একটি বই প্রকাশ করতে যেয়ে প্রকাশকরা দু'বার চিন্তা করবেন। কারণ বছরে যে কয়টি বই বিক্রি হবে তা দিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এদিকটা চিন্তা না করলেও চলে। ছাত্র-পাঠক সংখ্যার বিচারে যেকোন ভালো বই ওখানে প্রতি বছর যে সংখ্যায় বিক্রি হয় তাতে প্রকাশনা ব্যবসা একটি সফল ব্যবসায় পরিগণিত হতে বাধ্য।

পরিশেষে আমি বলবো, আমাদের নানা অসুবিধার মাঝেও উচ্চতর পর্যায়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান লেখার যে স্তরে আমরা আছি তা হতাশাব্যঞ্জক নয়। তবে যেহেতু উচ্চতর বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশনা ব্যবসায়িক দিক দিয়ে আপাততঃ লাভজনক বলে মনে হয় না সেহেতু এ সকল গ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকেই নিতে হবে। আরেকটি বিষয়েও চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে তা হলো: স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বই নির্বাচনে ও পাঠ্যতালিকায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সমতা আনা যায় কিনা। এই সমতা স্বাভাবিক কারণেই উচ্চতর পর্যায়ে বই প্রকাশনাকে উৎসাহিত করবে।

পরিশেষে বিজ্ঞানী সত্যেন বসুকে অনুসরণ করে বলতে চাই বাংলায় বিজ্ঞান লিখতে হলে ভালো বাংলা ও ভালো বিজ্ঞান উভয়ই জানতে হবে লেখককে; একটার অভাব অন্যটি দিয়ে পূরণ হবার নয় কখনো।

দৈনিক সংবাদ

13 APR 1986
৮ কলাম ৮